এক বজ্রের নির্মাণ : নিবেদিতা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

অত্যাচারী বৃত্রাসুরকে বধ করার একটিই উপায় ছিল—দধীচির অস্থি থেকে প্রস্তুত বজ্র। পরহিতে নিজের পবিত্র তনু দান করে দেবরাজ ইন্দ্রকে সে-কাজে সহায়তা করেছিলেন ঋষি দধীচি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ভারতের সমাজদেহ ক্রমবিকারগ্রস্ত, প্রায় পচনশীল। ইংরেজ শাসন ও শোষণ, সেই সঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষদের উপর উচ্চবর্গের মানুষদের দানবীয় ব্যবহার তাদের পশুপর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। সর্বোপরি সমাজের অর্ধাংশ নারীজাতি তাদের মনুষ্যসত্তাও ভুলতে বসেছে। এ-অবস্থায় প্রয়োজন ছিল আর এক দধীচির, যাঁর অস্থি থেকে এই ভয়ংকর দুর্দশা-রূপী বৃত্রাসুর বধের বজ্র তৈরি হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে মায়ের কাজ করতে আদেশ করলে তিনি বলেছিলেন, ''পারব না।'' শুনে ঠাকুর বলেন, ''তোর হাড় করবে।'' বস্তুত তা-ই হয়েছিল, তাঁর দেহত্যাগের পরেই এক জনজাগরণের জোয়ার সমাজে দেখা যায়।

সেই বজ্রনির্মাণের প্রস্তুতি চলেছিল স্বামীজীর পাশ্চাত্যবাসের সময়। বিধাতার অমোঘ নিয়মে স্বামীজীর ভাবসমূহকে যুবসমাজের বুকে বজ্রসম অভিঘাতে প্রবেশ করানোর উত্তরসূরি মার্গারেট নোবল জন্মগ্রহণ করেছিলেন আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন শহরে। তাঁর মাতামহ স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের হোতা ছিলেন। তাঁর প্রভাবে বালিকা হলেন সর্ববিষয়ে স্বাধীন ভাবনার অধিকারী। তাঁর মন সবরকম বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করত। তাঁর বুদ্ধি, প্রতিভা, সব কিছু যুক্তি-বিচার দিয়ে গ্রহণ করার ইচ্ছা, তাঁকে এক নতুন ভাবনা গ্রহণের উপযোগী করে তুলেছিল। এরপর সাক্ষাৎ ঘটল স্বামীজীর সঙ্গে।

রবিবারের এক সুন্দর বিকেলে ওয়েস্ট এন্ডের এক ঘরোয়া ক্লাস। মধ্যে স্বামীজী, চারপাশে সবাই উপবিষ্ট। তাঁর কমনীয় মুখ, বিদ্যুৎসম নয়ন ও মধুর ঘণ্টার মতন কণ্ঠস্বর মার্গারেটকে আবিষ্ট করে ফেলল। কিন্তু সে-ভাব গ্রহণের ক্ষমতা তখন তাঁর ছিল না। কারণ তাঁর আবাল্যচর্চিত ধর্মভাবনার বিপরীত সে-ভাবস্রোত। বিশ্বাস শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ faith, যার মধ্যে এক প্রশ্নহীন আনুগত্য বা অন্ধত্বের ভাব। কিন্তু বিশ্বাস বস্তুটি অনুভবজাত, সনাতন ধর্মে সে-বিশ্বাসেরই সাধন। স্বামীজীর 'অন্ধবিশ্বাস' শব্দটির ব্যবহারে শ্রীরামকৃষ্ণ আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, ''বিশ্বাসের আবার চক্ষু কি? হয় বল 'বিশ্বাস', আর নয় বল 'জ্ঞান'।'' তাই

স্বামীজীর faith এর বদলে realization শব্দটির ব্যবহার তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। কথাগুলি নতুন। যেমন পুনর্জন্ম একটি নতুন ভাবনা। মানুষ জন্মসূত্রে পাপী নয়, অজ্ঞানতাই পাপ, মিথ্যা বলে কিছু হয় না, সেটি সত্যেরই অশুদ্ধ প্রকাশ যা মায়া কর্তৃক আরোপিত, অতএব আমরা নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে উপনীত হই। মার্গারেটের যুক্তিবোধ এই কথাগুলির মধ্যে যেন সত্যের আভাস খুঁজে পেল। স্বামীজী মায়া সম্বন্ধে বললেন, ''আমরা এই জগৎ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি না; আবার জানি না—এ-কথাও বলিতে পারি না।... জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই অবস্থান, এই রহস্যময় কুহেলিকা, এই সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ—কোথায় মিশিয়াছে, কেহ জানে না। আমরা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতেছি—অর্ধনিদ্রিত, অর্ধজাগরিত, সারা জীবন এক অস্পষ্টতায় কাটিয়া যায়—ইহাই আমাদের প্রত্যেকের নিয়তি! সব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ওই নিয়তি। সকল দর্শনের, সকল বিজ্ঞানের, সকল প্রকার মানবীয় জ্ঞানের—যেগুলিকে লইয়া আমাদের এত অহংকার, সেগুলিরও এই নিয়তি—এই পরিণাম। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড...। এই আলো-অন্ধকারের খেলা... সর্বদা রহিয়াছে। সমুদয় ব্যাপার একবার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আবার বোধ হইতেছে—মিথ্যা।... ইহাকেই বলে মায়া।'' এই যুক্তিসিদ্ধ ভাবনার মধ্যে মার্গারেট এক পরম্পরা খুঁজে পেলেন। বুঝলেন এই মায়াতে ডুবে থাকাই বন্ধন আর তার পারে যাওয়ার নামই মুক্তি। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। খ্রিস্টধর্মের যে-নিঃস্বার্থ সেবার নীতি, যার পেছনে অনন্ত স্বর্গের হাতছানি কাজ করে, তাও যেন যুক্তিসিদ্ধ হল নতুন শোনা মানবাত্মার ঐক্যের তত্ত্বে। মার্গারেট আরও শুনলেন, জগতের সকল ধর্মই সত্য, কারণ তা একই সত্যে পৌঁছবার ভিন্ন ভিন্ন পথ।

স্বামীজী প্রথম জীবনে যেমন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত হলেও প্রথম দিনেই শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শের প্রভাবে এক অজ্ঞাত অনুভূতির অধিকারী হয়েছিলেন, এক্ষেত্রেও যেন তাই ঘটল। মার্গারেট তাঁর নিজের চিন্তাধারার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু এই গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত প্রাচ্য দর্শনতত্ত্ব তাঁর মনে এক গভীর ছাপ ফেলে গেল। সব ধর্মের প্রতি এই অত্যুদার দৃষ্টিভঙ্গি, কার্যকারণ ও দেশ-কালের অতীত এক অনন্ত সত্তার অস্তিত্বের ঘোষণা, তাঁর অন্তরে যেন এক পরম প্রাপ্তির আভাস নিয়ে এল। স্বামীজীর কাছে তিনি পেলেন সত্যকে যাচাই করে নেওয়ার, প্রশ্ন করার অধিকার, যা প্রতীচ্যের ধর্ম দেয় না। মার্গারেট জানলেন ধর্ম ও সত্য এক, তাই তা প্রশ্নকে ভয় পায় না। সত্যের অনুসন্ধানে প্রশ্ন ও তার উত্তরের সন্ধানই মানুষকে এ-পথে এগিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কারণ প্রশ্ন থেকেই ধর্মের উদ্ভব, অনুভবে যার উত্তরপ্রাপ্তি। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থে অনবদ্য ভাষায় এ-অবস্থাটির বর্ণনা দিয়েছেন : ''প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভেদ ক্রমেই মার্গারেটের নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিল। দুই বিভিন্ন সুর; একটি সুর যেন অতি প্রত্যুষে কোন নদীতীর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে—বাঁশীর সুরের মত সুমিষ্ট, কিন্তু উহা জাগতিক অন্যান্য সুমধুর সঙ্গীতের অন্যতম। আর একটি সেই সুর-লহরীই, কিন্তু শ্রোতা ক্রমশ তাহার সমীপবর্তী হইয়া অবশেষে এতদূর তন্ময় হইয়া যান যে, তাঁহার সমগ্র সত্তা সেই সুরে বিলীন হইয়া যায়—শ্রোতা পরিণত হন গায়কে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হয় ত্যাগের মাহাত্ম্য।''

কিন্তু তাঁর পাশ্চাত্য সংস্কার, যা তাঁর দৃঢ় অনমনীয় ভাবনার দ্বারা সুরক্ষিত তা কি এত সহজে পরিবর্তিত হতে পারে? এ-বিষয়ে তিনি পরবর্তী কালে লিখেছেন : ''অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত আমাদের মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে, বার বার

শ্রবণে তাহা বর্ধিত ও গাঢ় হয়। সেইরূপ, সেই বক্তৃতার সারাংশ এখন পড়িতে পড়িতে তখনকার অপেক্ষা বহুগুণ বিস্ময়কর মনে হইতেছে।" পাশ্চাত্যের ধর্মীয় চিন্তায় পরোপকারের অতি উচ্চস্থান। কিন্তু স্বামীজী বললেন, অধ্যাত্মজ্ঞান দান ছাড়া সমস্ত দানই নিম্নস্তরের। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক উন্নতির জন্য জীবনদান সাধুত্বের নিরিখ, কিন্তু স্বামীজী বললেন : ''জগতের প্রতি উদাসীন হও" কারণ ''আধ্যাত্মিকতায় সাংসারিকতার স্থান নাই।" এই বিপরীত ভাবনাগুলি মার্গারেটের মনে ঝড় তুললেও তা উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। তাঁর তীক্ষ্ণ প্রশ্নগুলি তীক্ষ্ণতর উত্তরে বিদ্ধ হত। একদিন তাঁর পাশ্চাত্য মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের উপর তীব্র আঘাত দিয়ে স্বামীজী বললেন : ''ইংরেজরা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছে, আর সর্বদা তাদের চেষ্টা দ্বীপেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।" কথাগুলি নিদারুণ হলেও সত্যের প্রতি আকুল আগ্রহ মার্গারেটকে নিজ ভাবনার সংকীর্ণতা বুঝতে সাহায্য করল। জগৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে বেশ সময় লেগেছিল তাঁর—যতদিন না বুঝলেন যে এ-জগৎ একটি শিক্ষালয় যা আমাদের অধ্যাত্মলাভের উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। স্বামীজী একদিন বললেন : ''জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারে 'ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল'। কে কে যেতে প্রস্তুত?" সবাইকে নিশ্চুপ দেখে আরও বললেন, ''কিসের ভয়? যদি ঈশ্বর আছেন একথা সত্য হয়, তবে জগতে আর কীসের প্রয়োজন? আর যদি সত্য না হয়, তবে এ-জীবনেই বা ফল কি?" কথাগুলি যেন মার্গারেটের মনে এক নতুন দিক খুলে দিল, তাঁর চিন্তায় অনুরণিত হতে লাগল। কিন্তু করণীয় কী? স্বামীজীর চিঠিতে তার একটা আভাস পাওয়া গেল (৭ জুন ১৮৯৬) : ''...জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করে তুলবে।... হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?" মার্গারেট বুঝলেন প্রয়োজন নিজেকে নিঃশেষে তাঁর হাতে সমর্পণ। স্বামীজী ওই চিঠিতেই আরও বললেন : ''আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি—ওঠ, জাগো।"

বাণীগুলি মর্মে বিদ্ধ হল মার্গারেটের; স্থির করলেন নিজের স্বপ্ন, এতাবৎ পোষিত ভবিষ্যদ্-ভাবনা, জীবনদর্শন, সর্বস্ব ত্যাগ করে আত্মনিবেদনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। এই সংকল্পের দৃঢ়তা তাঁর চোখেমুখে হয়তো প্রকাশ পেয়ে থাকবে, তাই স্বামীজী হঠাৎ একদিন তাঁকে বললেন : ''স্বদেশের নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতগুলি সংকল্প আছে, আমার মনে হয়, সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার।" মার্গারেট বুঝলেন এ-আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুতি দরকার।

স্বামীজী ভারতেবর্ষে ফিরে কাজ সম্বন্ধে চিঠিতে তাঁকে জানাতেন। উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কর্মের প্রায়োগিক দিকটির ভিন্নতা তাঁকে বোঝানো। লিখলেন (৪ জুলাই ১৮৯৭) : ''ভারতে বক্তৃতা ও অধ্যাপনায় বেশি কাজ হবে না। প্রয়োজন সক্রিয় ধর্মের। আর মুসলমানদের কথায় বলতে গেলে 'খোদার মর্জি হলে'—আমি তাই দেখাতে বদ্ধপরিকর।" এদেশের জলবায়ু পাশ্চাত্যবাসীদের পক্ষে পীড়াদায়ক। একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন ভাষার মানুষদের মধ্যে কাজ করার মানসিকতা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত করতে চেয়ে স্বামীজী লিখলেন (২৯ জুলাই,

১৮৯৭) : ''এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কি ধরনের, তা তুমি ধারণা করতে পারো না। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা; ভয়েই হোক বা ঘৃণাতেই হোক—তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গেরা তোমাকে খামখেয়ালী মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখবে।... এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি।''

এভাবে স্বামীজী যথেষ্ট নিরাশাব্যঞ্জক সত্যটি তুলে ধরলেন মার্গারেটের সামনে এবং তার সঙ্গে সাবধানবাণী : ''তোমাকে... মিস মুলার কিংবা অন্য কারও পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে চলবে না।... একমাত্র সেভিয়াররাই আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করতে এদেশে আসেননি।... তুমি এলে তোমার সহকর্মিরূপে তাঁদের পেতে পারো... কিন্তু আসল কথা এই যে, নিজের পায়ে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে।'' স্বামীজী সেইসঙ্গে তাঁর বিশাল হৃদয়ের পরিচয় রাখলেন ওই চিঠিতেই : ''কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো, এবং কাজের পরে যদি বিফল হও, কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্তধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাক।'' এত বড় আশ্বাসের পর আর চিন্তা রইল না, চলে এলেন ভারতে।

এইবার মার্গারেটের শিক্ষার নূতনতর দিক। পাশ্চাত্যে স্বামীজীকে দেখেছেন বিশ্বমানবতার পথিক, চৌম্বক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অশ্রুতপূর্ব বাগ্মী, অনন্যসাধারণ পণ্ডিত অথচ মানবপ্রেমে বিগলিত মূর্তিরূপে। ভারতে তাঁকে পেলেন মুণ্ডিতমস্তক, কাষায়-কৌপীনধারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরূপে। দেখলেন সুতীব্র ত্যাগ ও অনাসক্তির মধ্যেও, অতুল অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী হয়েও ভারতবাসীকে উদ্ধারের জন্য এক আকুলপ্রাণ পুরুষকে। দেখলেন তাঁর মধ্যে তত্ত্বের, আদর্শের মহিমময় প্রকাশ ও জাগতিক বিষয়ে তার প্রয়োগ। স্বামীজী জানেন মার্গারেটের প্রবল কর্মশক্তি, কিন্তু তার প্রেরণার পরিবর্তন দরকার। পাশ্চাত্যে সমাজসেবা হল অনন্ত স্বর্গদায়ী পুণ্যকর্ম, মার্গারেটের ক্ষেত্রে এর পেছনে চাই আধ্যাত্মিকতার বৈদান্তিক ভিত্তি, যে-ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন আচারের এক মানবজাতিকে আপনবোধে তার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। এজন্য প্রথমেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও আচারগত সংস্কারের পরিবর্তন প্রয়োজন। ইংরেজ জাতি রক্ষণশীল, খুব ঘনিষ্ঠ না হলে কারও কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পারে না। হয়তো এ-বিষয়ে মার্গারেট স্বামীজীকে কিছু লিখে থাকবেন। স্বামীজী তাঁকে জানালেন (২৩ জুলাই ১৮৯৭) : ''ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও সরলতা থাকতে পারে—তোমার এ কথার যে কি অর্থ, তা তো আমি বুঝি না। আমার দিক থেকে বলতে পারি যে, প্রাচ্য লৌকিকতার সামান্য যা এখনও আমার আছে, তার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলে দিয়ে শিশুসুলভ সরলতা নিয়ে কথা বলার জন্য আমি প্রস্তুত। আহা, যদি একটি দিনের জন্যও স্বাধীনতার পূর্ণ আলোকে বাস করা যায়, এবং সরলতার মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করা যায়, তাই কি শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা নয়?''

কর্মের দিঙ্‌নির্দেশ দিলেন স্বামীজী নিজের উদাহরণ দিয়ে (১ অক্টোবর ১৮৯৭) : ''কর্মের সাফল্যের জন্য যত বেশী সম্ভব লোকের উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ আমার একান্ত প্রয়োজন; অথচ আমাকে সম্পূর্ণভাবে সব গণ্ডির বাইরে থাকতে হবে।... নেতা যিনি, তিনি থাকবেন ব্যক্তির গণ্ডির

বাইরে।... আমি যা বলতে চাই, তা আমার নিজের জীবনেই পরিস্ফুট; আমার ভালবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিস, আবার প্রয়োজন হলে—বুদ্ধদেব যেমন বলতেন,... 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়'—তেমনি আমি নিজ হস্তেই আমার হৃদয় উৎপাটিত করতে পারি। এ প্রেমে উন্মত্ততা আছে, কিন্তু কোন বন্ধন নেই।"

এ শুধু কর্মের কৌশলগত নির্দেশ ছিল না, ছিল ব্যক্তিপূজার ঊর্ধ্বে উঠে আদর্শকে আত্তীকরণের আহ্বান। ভারতের জন্য কাজ করতে হলে, তার সঙ্গে একাত্মবোধ করতে গেলে তাকে ভালবাসতে হবে, আর সে-পথের বড় বাধা স্বজাত্যাভিমান। ভারতবাসীর প্রতি করুণায় নয়, আত্মবোধে সেবা চাই। তাই মার্গারেটের প্রবল স্বজাত্যাভিমানকে নাশ করতে চরম আঘাত দিয়ে স্বামীজী বললেন, ''বাস্তবিক, তোমার যেরকম স্বজাতিপ্রেম, ও তো পাপ। আমি চাই তুমি এইটুকু ধারণা কর যে, অধিকাংশ লোকেই স্বার্থের প্ররোচনায় কাজ করে। কিন্তু তুমি ক্রমাগত এই সত্যটিকে উল্টে দিয়ে প্রমাণ করতে চাও, একটি জাতিবিশেষের সকলেই দেবতা। অজ্ঞতাকে এরকম আগ্রহের সঙ্গে ধরে থাকা মন্দবুদ্ধির পরিচয়।"

সবরকম বন্ধনের বিপক্ষে স্বামীজী। তাই যখন নিবেদিতা বললেন যে, হিন্দুদের এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তিনি বুঝতে পারেন না বরং মনে করেন যে সকলকে সাহায্য করা রূপ মহৎ কার্য করতে বহুবার জন্ম নেওয়াই বাঞ্ছনীয়, তখন স্বামীজী তীব্রস্বরে বলে ওঠেন: ''তার কারণ তুমি ক্রমোন্নতির ধারণাটা (জগতের মঙ্গল করতে করতে সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়ে কেবল মঙ্গলই অবশিষ্ট থাকবে) জয় করতে পার না। কিন্তু কোনও বাইরের জিনিসই ভাল হয় না। তারা যেমন আছে তেমনি থাকে। তাদের ভাল করতে গিয়ে আমরাই ভাল হয়ে যাই।" ভারতীয় হয়ে উঠতে গেলে ভারতের ভাবনা, জীবনচর্যা, আচার-অনুষ্ঠান—যা পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে যতই অদ্ভুত লাগুক তার বিশ্লেষণ ও আত্তীকরণের প্রয়োজন আছে, কারণ এসবের মধ্য দিয়েই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সুরটি ধ্বনিত। ভারতীয় জীবনচর্যা যা বৈদান্তিক ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেটি কালের প্রভাবে মলিন হয়ে গেলেও তার অনুসরণ যথার্থ বৈদান্তিক হয়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল। এই শিক্ষাকাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরবর্তী কালে নিবেদিতা লিখেছেন : ''এই প্রাতঃকালীন আলোচনাসমূহ আমাদের সামাজিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা-বিষয়ক বদ্ধমূল পূর্বসংস্কার-গুলির সহিত সংঘর্ষের আকার ধারণ করিত...।"

কিন্তু এক দরিদ্র, অনগ্রসর জাতিকে ভালবাসায় আপন করে নেওয়া কি সোজা কথা? মার্গারেট দেখেছেন ভারতবাসীর জন্য স্বামীজীর তীব্র বেদনাবোধ—সমগ্র জগতকে আলিঙ্গন করা সত্ত্বেও। এই অনুন্নত ভারতই জগতকে এই মহামানব উপহার দিয়েছে। স্বামীজী যে ভারতের নারীর সুমহান আদর্শের উল্লেখ করেন তার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখা বাকি ছিল। স্বামীজী তাঁকে পাঠালেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। শ্রীশ্রীমা এক অভাবনীয় সংস্কারমুক্ত উদারতায় মার্গারেটের চিবুক ধরে চুমু খেয়ে, তাঁর সঙ্গে একত্রে প্রসাদ গ্রহণ করে, তাঁকে নিজের মেয়ে বলে গ্রহণ করলেন। মার্গারেটের মনে হল মা যেন তাঁকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এই দিনটিকে তিনি ডায়েরিতে লিখে রাখলেন ১৭ মার্চ 'day of days' বলে। তিনি গোপালের মায়ের কথা শুনেছিলেন। খুব সম্ভবত সারদানন্দজীর সঙ্গে সারা বুল, ম্যাকলাউড ও মার্গারেট তাঁকে দর্শন করতে যান। সারদানন্দজী লিখছেন : ''গোপালের মা সেদিন তাঁহার গোপালকে তাঁহাদের ভিতরেও অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের দাড়ি ধরিয়া সস্নেহে চুম্বন করেন, আপনার

বিছানায় সাদরে বসাইয়া, মুড়ি, নারিকেল, লাড্ডু প্রভৃতি যাহা ঘরে ছিল তাহা খাইতে দেন ও জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার দর্শনাদির কথা তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বলেন। তাঁহারাও উহা সানন্দে ভক্ষণ ও তাঁহার ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া মোহিত হন এবং ঐ মুড়ির কিছু আমেরিকায় লইয়া যাইবেন বলিয়া চাহিয়া লন।" স্বামীজী শুনে বলেছিলেন : ''আহা, তোমরা প্রাচীন ভারতকে দেখে এসেছ। উপাসনা ও অশ্রুবর্ষণ, উপবাস ও রাত্রিজাগরণ—সে ভারত বিদায় নিচ্ছে।" এই দুই মাতৃমূর্তির ব্যবহার তাঁর মনে এক গভীর ছাপ রেখে গেল।

২৫ মার্চ ১৮৯৮। সেই প্রভাতটি তাঁর জীবনের 'সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত'রূপে প্রকাশিত হল। দিনটি ছিল সেদিন, যেদিন দেবদূত মা মেরিকে তাঁর গর্ভে ভগবানের জন্ম নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন—The Day of Annunciation। স্বামীজী মার্গারেটকে শিবপূজা করিয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করলেন ও বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়ে বললেন : ''যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে পাঁচশত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ করো।" নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল সন্ন্যাসের, কিন্তু পেলেন আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা। ভূয়োদর্শী স্বামীজী সম্বন্ধে এ নিয়ে প্রথমে একটু অভিমান থাকলেও পরে তা কেটে যায়। পরের বছর কলকাতার ইংরেজ মহলে যখন তাঁর স্বীকৃতিলাভ হচ্ছে, সে সময় (৮ এপ্রিল ১৮৯৯) মিস ম্যাকলাউডকে তিনি লিখেছেন, ''এক্ষেত্রে আমাকে চলিত জীবনরীতি সম্বন্ধে মামুলি ধারণা কিছু শিথিল করবার চেষ্টা করতে হচ্ছে। কারণ ওইসব মহলে আমার কিছু যথার্থ কাজ করার আছে। গতকাল সহসা মাথায় খেলে গেল— এইজন্যেই হয়তো আমাকে স্বামীজী সন্ন্যাসিনী না করে ব্রহ্মচারিণী করেছেন।" ত্যাগ ও সেবার আদর্শে নিবেদিত এই প্রাণের নাম স্বামীজী দিলেন 'নিবেদিতা'। কিন্তু তখনও পূর্ণভাবে নিবেদিত হতে কিছু বাকি ছিল।

স্বামীজী তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন নির্মম। যদিও যুক্তিবিচারের সাহায্যে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে বলে নিবেদিতাকে বলেছিলেন যে তিনি নিজে দীর্ঘ ছয় বছর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন তাই তাঁর এ-পথের প্রতি ইঞ্চি জানা, তবু এ-শিক্ষা বৌদ্ধিক পর্যায়ে সীমিত রাখলে তো চলবে না, চাই অনুভব। যে-আদর্শের প্রকাশে স্বামীজী সকলের মান্য ও পূজনীয়, চাই সে-আদর্শের অনুভব ও অনুসরণ। নিবেদিতার যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করে তিনি একটা উপেক্ষা, উদাসীনতার ভাব দেখাতে লাগলেন। নিবেদিতার অন্তর এ-অবহেলায় দগ্ধ হতে লাগল। সোনাকে নিখাদ করতে আগুন ও আঘাত দুই-ই দরকার। একসময় স্বামীজী বলেছিলেন, ''হ্যাঁ, তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু যে জ্বলন্ত উৎসাহ দরকার—তাহা তোমার নাই। তোমাকে 'দগ্ধেন্ধনমিবানলম্' হইতে হইবে...।" স্বামীজীর ভাবধারাকে নিঃশর্তে গ্রহণ করার পথে বাধা ছিল তাঁর যুক্তিবোধ, নিজের বুদ্ধি, প্রতিভার ওপর আস্থার অহং, কিন্তু তা বোঝার মতন সময় তখনও হয়নি। তাই যাঁর ওপর নির্ভর করে তাঁর এদেশে আসা, যাঁর প্রতি তাঁর আত্মসমর্পণের অঙ্গীকার, তাঁর কাছ থেকে এই উপেক্ষা তাঁর হৃদয়কে নিরন্তর দগ্ধ করতে লাগল। মিস ম্যাকলাউডের তখন তাঁর উপর মাতৃসম স্নেহ। তিনি তাঁর যন্ত্রণা উপলব্ধি করে একদিন তা স্বামীজীর গোচরে আনলেন। আলমোড়াতে হিমালয়ের কোলে সে এক রাত্রি, আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ। স্বামীজী নীরবে সব শুনে চাঁদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ''দেখ, মুসলমানেরা দ্বিতীয়ার চাঁদকে বিশেষ সমাদরের চোখে দেখে। এসো, আমরাও এই নবীন চন্দ্রমার সঙ্গে নবজীবন আরম্ভ করি।" একথা বলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত

তুললেন। নিবেদিতার অন্তরের বিদ্রোহ, হতাশা, অভিমান কোথায় ভেসে গেল। তিনি গুরুর চরণে নতজানু হলেন আর স্বামীজীর দুহাতের যুগ্মস্পর্শ মাথায় অনুভব করলেন। সে-স্পর্শে বিশেষ কিছু ছিল, যে-কারণে সে-রাত্রে তাঁর গভীর ধ্যান তাঁকে অন্তরস্থিত অননুভূত সম্পদের সন্ধান দিল। সেইসঙ্গে যে-অনমনীয় হৃদয়বৃত্তি পূর্ণ আত্মসমর্পণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা কোথায় বিলীন হয়ে গেল। নিবেদিতা হৃদয়ংগম করলেন গুরুকৃপা, আর হিন্দু দর্শনের অনুভূতিসঞ্জাত সত্য। পরবর্তী কালে তিনি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন : ''শিখিবার বিষয় অনেক ছিল, কিন্তু সময় ছিল কত অল্প! শিক্ষার্থীর অহংনাশই ছিল শিক্ষার প্রথম সোপান।''

এ-বজ্রনির্মাণের শেষটুকু শিষ্যাকে অমরনাথের যাত্রাপথে সঙ্গী করে। অমরনাথের গুহায় স্বামীজী খুব অল্পসময় থেকেই বেরিয়ে আসেন, পাছে ভাবে আত্মহারা হয়ে যান। সেই দিব্য আত্মমগ্ন মূর্তি দেখে পুলকিত নিবেদিতা মিসেস হ্যামন্ডকে লিখছেন (৭ আগস্ট) : ''এ আমার নিত্য স্মৃতি হয়ে রইল, নিশ্চয়ই, এবং তিনি সত্যই শিবের কাছে আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন,... তাঁর মুখে সেকথা শোনার পর থেকে আমি দারুণ দ্রুতবেগে হিন্দু হয়ে উঠছি ভাবাদর্শে।'' এ-চিঠিতেই তাঁর কৃতকর্মের জন্য আক্ষেপ : ''এখনও পর্যন্ত সেই সময়টির দিকে ফিরে চাইলে আমার হৃদয় দারুণ ক্ষোভে ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে যায়। সে আমারই দোষ জানি, রাজাও (স্বামীজী) আমাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করেছেন, এবং বিচিত্রভাবে আমি তাঁর মনের নিকটতর হয়েছি...।'' স্বামীজী এই তীর্থদর্শনের পর নিবেদিতাকে বলেছিলেন, ''তুমি এখন বুঝতে পারছ না; কিন্তু তীর্থদর্শন তোমার হয়ে গেল, এর ফল ফলতে থাকবে। পরে আরও ভাল করে এর তাৎপর্য বুঝবে। ফল হবেই।'' শিষ্যাকে অমরনাথের শ্রীচরণে নিবেদন করে সে-নির্মাণের শেষকৃত্য!

নিবেদিতার রূপান্তরের যে-অঙ্কুর দেখা দিল তা পল্লবিত হল পরবর্তী ঘটনায়। প্যারিসে আন্তর্জাতিক ধর্মসম্মেলনে শ্রদ্ধাপূর্ণ আহ্বান এবং ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের চেষ্টায় সমুদ্রযাত্রা—মূলত এ-দুটি কারণই স্বামীজীকে পুনর্বার পাশ্চাত্য ভ্রমণে প্রণোদিত করে। ২০ জুন ১৮৯৯ যাত্রা শুরু হল। সঙ্গী হলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ আর নিবেদিতা। উদ্দেশ্য—ভারতে কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ। স্বামীজীর সঙ্গে এই সমুদ্রযাত্রার দীর্ঘ ছয়সপ্তাহ নিবেদিতার জীবনের এক অমূল্য সময়। দিব্যভাবে উচ্চারিত কথাগুলি, সময়ে সময়ে স্বামীজীর আত্মমগ্ন দিব্যমূর্তি, তাঁর হৃদয়পটে চিরন্তন হয়ে রইল।

তাঁর এই সময়ের ভাবনা ধরা আছে, জাহাজ থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিগুলিতে। পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব থেকে লিখছেন (১৫ জুলাই) : ''এখন ভাল হোক, মন্দ হোক, তিনিই সব কিছু—তিনি আরও বড় হয়ে উঠেছেন। আমি আমার অনুরক্তিতে নিতান্ত ব্যক্তিগত হয়ে উঠছি। তাঁর সামান্যতম খেয়ালও আমার কাছে সর্বস্ব। যদি কেউ তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়, মনে হয় তার সত্তা মুক্ত হয়ে গেল। ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমার এমন ভালবাসা সম্ভব করলেন।'' আরও লিখছেন (জুলাই ১৯) : ''আহা, পৃথিবীর এই মহত্তম আত্মাকে অর্চনা করবার সুযোগ যারা পেল না, তাদের জীবনের কোনও মূল্য আছে কি?... ইংল্যান্ডের ভূমি স্পর্শ করবার আগামী ক্ষণটিকে কী যে আতঙ্কের চোখে দেখছি! তখন যে আমার পূজার এই দীর্ঘ ভাবোন্মাদনার অধ্যায়টি শেষ হয়ে যাবে।'' স্বামীজীর মূল্যবান উপদেশগুলি বিভিন্ন চিঠিতে জানাচ্ছেন : ''স্বামীজী বারবার বলেছেন, আমাকে আমার হৃদয়ের গভীরে নেমে সন্ধান করতে হবে প্রেরণার; তা পাওয়ার পরে তাকেই বিশ্বাস করতে হবে আমাকে, আর কিছুকে নয়।'' ''পাশ্চাত্যের মানুষকে ঠকিয়ো না,

কদাপি তাদের বোলো না যে, তাদের অনুরূপ এ বি সি.... তাদের শিক্ষাপদ্ধতি দেওয়ার জন্য তুমি টাকা চাইছ। বলো যে, পুরনো ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার শিক্ষাই তুমি দিতে চাইছ। সাহায্য দাবি করো, তাকে কিনবার চেষ্টা কোরো না। মনে রেখো, তুমি মায়ের দাসী।" ''আবেগহীন ভাবে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করো। তা করতে পারলে পৃথিবীর উপর বজ্রের মতো ফেটে পড়তে পারবে।... যার সত্যই কিছু বলার আছে, তার কথা পৃথিবী শোনেনি, এমন হয়নি এ পর্যন্ত। নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে ওঠো।" নিবেদিতার চোখে স্বামীজী তখন কী, তার একটি আভাস পাই ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে (১২ আগস্ট) : ''(শিল্পী এবেনজার কুক) সেন্ট ফ্রান্সিস সম্বন্ধে আর্ল বার্নফের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলেন। ভাষণের পর চার্চের সিঁড়িতে যখন দাঁড়িয়ে আছেন, ই. টি. স্টার্ডি তাঁর কাছে এগিয়ে এসে নিচু স্বরে বললেন, 'আর একজন খ্রিস্টের জন্মের জন্য পৃথিবী প্রস্তুত, একথা কি আপনার মনে হয় না?' উত্তরে কুক বললেন, 'আপনি কি স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন?' " ৬ ডিসেম্বর স্বামীজী নিবেদিতাকে লিখলেন, ''কর্মকৌশল তো ঐখানেই।... যদি সত্যই জগতের বোঝা স্কন্ধে নিতে তুমি প্রস্তুত হয়ে থাকো, তবে সর্বতোভাবে তা গ্রহণ করো; কিন্তু তোমার বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের শুনতে না হয়। তোমার নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে আমাদের এমন শঙ্কিত করে তুলো না যে, শেষে আমাদের মনে করতে হয়, তোমার কাছে না এসে আমাদের নিজের দুঃখের বোঝা নিয়ে থাকাই বরং ছিল ভাল।... যিনি পরিত্রাতা, তাঁকেই সানন্দে আপনপথে চলতে হবে; যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে, এ-কাজ তাদের নয়।"

এরপর স্বামীজী নিবেদিতাকে বিদায়ী আশীর্বাদ জানালেন এক বিস্ফোরক বাণীর মাধ্যমে : ''যাও, কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দাও। যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি, বিনষ্ট হও। আর যদি মহামায়া তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, সার্থক হও।"

যে-প্রেমে বজ্রসম হয়ে ওঠে মানুষ; যা অশনিপাত ঘটায় না কিন্তু বজ্রকীট হয়ে নীরবে অথচ নিশ্চিন্ত দৃঢ়তায় পর্বতপ্রমাণ বাধাকে ভেদ করে আপন পথ করে নেয়, সেই প্রেমের উদয় এবার নিবেদিতার জীবনে। তাঁর চোখে এখন ভারতের সবকিছুই সুন্দর। স্বামীজী দিলেন অপার স্বাধীনতা, বললেন যিনি তাঁকে প্রেরিত করেছেন তিনি নিবেদিতারও অন্তরে। নিবেদিতা সাহেবপাড়া দেখেছেন, দেখেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী। শ্রীমাকে দেখতে বাগবাজারে এসে দেখেছিলেন হিন্দুসমাজকে—তার গলি, আবর্জনাসংকুল রাস্তাঘাট এবং উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষের জটিল এক সহাবস্থানের মধ্যে। বুঝেছিলেন শত জটিলতার মধ্যেও হিন্দুসমাজের প্রাণপ্রদীপটি এখানেই এবং এটিই তাঁর কর্মক্ষেত্র। অতএব ১৩ নভেম্বর ১৮৯৮ কালীপূজার দিন বাগবাজারে শুরু হয়েছিল এক বালিকা বিদ্যালয়; যার সূচনায় ছিল শ্রীমায়ের উদ্বোধন-কর্মের পূজা ও প্রার্থনা। এই স্কুল নিয়ে স্বামীজীর অসীম আগ্রহ ছিল। তাঁকে শেষ চিঠিতে লিখলেন : ''সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিত হোন!... যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেমনভাবে তিনি আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে কিংবা তার চেয়ে সহস্রগুণ স্পষ্টভাবে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।"

এল ১৯০২। ২ জুলাই নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে মঠে দেখা করতে গিয়ে তাঁর অসীম ভালবাসায় অভিভূত, কিন্তু সেইসঙ্গে শুনে এলেন : ''আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে।" নিবেদিতা স্বামীজীর মানসকন্যা—এটি আলংকারিক নয়। তাঁর স্বীকারোক্তি ওলি বুলকে

(৬ মার্চ, ১৮৯৯) : ''স্বামীজী এখন স্বস্থানে। আমি আবার পিতাকে পেয়েছি, যাঁকে হারিয়েছি দশ বছর বয়সে।'' তাঁর অধীর ভালবাসার প্রকাশ দেখি ৮ এপ্রিল ১৮৯৯ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে, যখন যোগানন্দজীর মৃত্যুজনিত শোক ও ডায়াবেটিসের আক্রমণ স্বামীজীকে প্রায় শয্যাশায়ী করে ফেলেছিল : ''মঠে গিয়েছিলাম।...স্বামীজীকে এত রোগা, রুগ্ন আর ফোলা-চোখ দেখাচ্ছিল...! গতকাল তাঁর শীর্ণ দুর্বল চেহারা দেখে আমার বুক ভেঙে গেছে।... অবুঝ ভয়ের আক্রমণ।... কিন্তু য়ুম, কী আসন্ন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা—তত্ত্বদর্শন এখন কোনওই সাহায্য করছে না। যদি সমাধি তাঁর আসন্ন হয়, তাহলে যাবার আগে তাঁকে একটু শান্তি আর বিশ্রাম দিয়ো—আর তাঁর যন্ত্রণাটুকু নিতে দিয়ো আমাকে—একথা বলা হয়তো ছেলেমানুষি, কিন্তু ভগবান যদি সত্যই স্বামীজীকে শেষক্ষণে যথেষ্ট কষ্ট দেন, তাহলে সে-ভগবানকে আমি জানতেও চাই না, ভালবাসতেও চাই না।'' এ যেন পিতৃনির্ভর কন্যার হৃদয়-নিঙড়ানো আর্তি। তাঁর ওই উক্তি মেনে নেওয়া কঠিন, তবু যা ঘটল তা যেন অবধারিত ছিল। ৪ জুলাই ১৯০২। স্বামীজী শরীর ছেড়ে দিলেন জীর্ণ বস্ত্রের মতো। স্বামীজীর চিতার পাশে শোকে চিত্রবৎ দাঁড়িয়ে নিবেদিতা। মনে বাসনা ছিল যদি তাঁর কোনও স্পর্শধন্য স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায়। হঠাৎ জ্বলন্ত চিতা থেকে স্বামীজীর পরিধেয় বস্ত্রের এক টুকরো শোকমগ্ন নিবেদিতার সামনে উড়ে এসে পড়ল। তিনি তাঁর জীবন-দেবতার দেওয়া জ্বলন্ত ত্যাগের প্রতীক এই শেষ উপহার মাথায় ঠেকিয়ে গ্রহণ করলেন।

পিতৃহারার গভীর শোক পরিবর্তিত হল তাঁরই প্রদর্শিত কর্মপ্রেরণায়। ১৬ জুলাই ম্যাকলাউডকে লিখলেন : '' 'আমার মরণ মহামরণ হবে; হর! হর! হর! বলতে বলতে চলে যাব'—বহুদিন আগে তিনি একদা বলেছিলেন মনে পড়ে। সেকথা সত্য হল। মালা এখনও শুকোয়নি, বর্ম অটুট, সবই ঠিক আছে—তিনি চলে গেলেন। স্বামীজী! স্বামীজী! আপনার অন্তরের অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ করতে পারি...।'' ২৮ আগস্ট নেল হ্যামন্ডকে লেখা চিঠি : ''ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর মূল সাধনার উত্তরাধিকার নিতে আমার প্রাণ কী যে ব্যাকুল কী বলব!... তিনি নেই—একথা সত্য নয়; তিনি আছেন—সর্বদা আছেন আমাদের মধ্যে। শোক পর্যন্ত করতে পারছি না—শুধু কাজ করতে চাই।''

গুরুর আশীর্বাদ সম্বল করে শুরু হল তাঁর এগিয়ে চলা। শরীরত্যাগের কয়েকমাস আগে স্বামীজী নিবেদিতাকে ভবিষ্যতে সহায়তার ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২) : ''আমি আর কারও উপর নির্ভর করতে বলি না—আর কেউ নয়—একমাত্র ব্রহ্মানন্দ। সেই 'বৃদ্ধের' বিচারে কখনও ভুল হয় না—আমার সর্বদাই হয়। যদি কোনও বিষয়ে তোমার পরামর্শের প্রয়োজন হয়, কিংবা কাউকে দিয়ে কোনও কাজ করিয়ে নিতে চাও—তাহলে শুধু ব্রহ্মানন্দেরই নাম করব—অন্য কেউ নয়, কেউ নয়।'' স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই নিবেদিতা রাজনীতিতে অল্পবিস্তর জড়িয়ে পড়তে থাকেন। স্বামীজীর অবর্তমানে ব্রহ্মানন্দজী এ-বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় নিবেদিতা তাঁর স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে বাহ্যত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেন। কিন্তু সঙ্ঘ তো বটেই, তার অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দের সঙ্গেও তাঁর আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। এ-বিষয়ে লিজেল রেমঁর রচিত একটি চিত্র এরকম : ''নিবেদিতার ধরনধারণে সায় না থাকলেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। এই মন-কষাকষির ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য নিবেদিতা একদিন আচমকা তাঁকে ধরে বসলেন। কিন্তু আলোচনাটা তলিয়ে গেল ধ্যানতন্ময়তায়। আধঘণ্টা পরে ব্রহ্মানন্দ চোখ মেলে চাইলেন।

নিবেদিতা তখনও নিস্পন্দ, অক্ষুব্ধ শান্তির পারাবারে তাঁর মন ডুবে গিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে রয়েছে নিবিড় ঐক্যবোধ।" এই ধ্যানতন্ময়তা, গুরুভক্তি ও ভারতবাসীর প্রতি অগাধ প্রেম, এই সম্পদগুলিকে অবলম্বন করে তিনি ঝাঁপ দিলেন কর্মে।

যুবসমাজের উদ্দেশে নিরলস বক্তৃতা আর লেখা, স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের নৈতিক সমর্থন ও সেইসঙ্গে ভারতীয় রীতিতে নারীশিক্ষার পথিকৃৎ হওয়ার কারণে অনন্ত সংগ্রাম। ভারতীয় যা কিছু; শিল্প, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্যকে সমাজের কাছে তুলে ধরার নিরন্তর প্রয়াস ও নারীশিক্ষার মাধ্যমে তাদের আন্তর সম্পদের বিকাশ ঘটাতে তাঁর কর্মের পূর্ণ মূল্যায়ন এখনও হয়নি। নারীকল্যাণের যা কিছু আজ চোখের সামনে, তার শুরু নিবেদিতার হাত ধরে। স্বামীজীর পরিকল্পিত সন্ন্যাসিনী-মঠের বীজও উপ্ত তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে। ভারতবর্ষ শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটি এক অদ্ভুত প্রেমে দীপ্ত হয়ে উঠত। দধীচির আত্মবলিদানকাহিনি তাঁর কাছে প্রবল গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যে-কারণে তিনি ভারতবর্ষের ত্যাগ ও সেবার জাতীয় প্রতীক হিসাবে বজ্রকে ভেবেছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় পতাকায় অগ্নিবর্ণ প্রেক্ষাপটে বজ্রের চিহ্ন, দেশপ্রেমের আগুনে আত্মবলিদানের রূপক। তাঁর ভাবশিষ্য বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু তাঁরই প্রেরণায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নির্মাণ করে তার শীর্ষে বজ্রচিহ্ন উৎকীর্ণ করে দিয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে নয়, আচারগত সংস্কারের মাধ্যমে নয়, এমনকী অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়েও নয়, নিবেদিতার ভাবনায় ছিল এ-জাতির সমস্ত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ধর্মের যে-মূল সুর, তাকে ভিত্তি করে এক জাতীয়তার সৃষ্টি করা; যে-জাতীয়তার বলে মাথা উঁচু করে ভারতবাসী তার সর্ববিষয়ে বন্ধনমুক্তির পথ খুঁজে নেবে। সেটিই পরবর্তী ইতিহাস যা আমাদের অগ্রগতির প্রেরক হয়ে আছে।

নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন (৮ মে ১৮৯৯) : ''(স্বামীজী বললেন,) 'আরে, ধর্মের মূল কথা-কয়টা আঙুলে গোনা যায়। তত্ত্বকথা নয়—মানুষটাই আসল...!'... এখন আমার মনে পড়ছে এসব কথা বলার আগে তিনি বলেছিলেন—রামকৃষ্ণের উক্তি নয়, রামকৃষ্ণের সঙ্গে যে-জীবন তাঁরা যাপন করেছিলেন, তারই প্রয়োজন,... সে জিনিস এখনও লেখা হয়নি।" স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য, অনাহার ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই অলিখিত জীবন যাপনের নিরন্তর প্রয়াস তাঁর। ভারত তাঁকে খুব অল্পদিনই পেয়েছে কিন্তু তাঁর জীবন আজও জাতির জীবনে মুক্তির আশ্বাস বয়ে আনে। স্বামীজী একদিন তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন : ''নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ... নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসেনি।" সেই মহৎ প্রাণকে তিনি বলি দিয়ে গেলেন এ-জাতির কল্যাণের জন্য। ১৯১১ সালে ভারতের জন্য তাঁর দেহোৎসর্গ। রেখে গেলেন এক অমূল্য প্রেরণা।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সেকি সহজ গান!
সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান॥
আমি ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ॥ ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা* (সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল : কলকাতা, ২০০৫)

২। ভগিনী নিবেদিতা, *স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০০)

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০০)